আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ি— রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্মমধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। আকাশ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, যেন একতানে গান করিতেছে ঃ

“আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—ভগবৎ মঙ্গল কিরণে!”

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাড়ি আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছেন। তিনি আসিয়াছেন। চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতেছে।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠমধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে। সে-স্থান লোকে পরিপূর্ণ। সম্মুখে দালান, সেখানে পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর—সে-ঘরেও লোক— ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২/৩টি বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ—সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন। তথা হইতেও লোক উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারিসারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষসকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্তির উপর পতিত হইল। যেমন, যতক্ষণ নাট্যশালার অভিনয় আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ বিষয়কর্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে; কিন্তু যাই ড্রপসিন উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে! অথবা যেমন, নানা পুষ্প-পরিভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ [গীতা—১৪।২৬]

ভক্ত-সম্ভাষণে

সহাস্যবদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর-একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয়। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে।” (শিবনাথ ও সকলের হাস্য)

[সংসারী লোকের স্বভাব—নামমাহাত্ম্য]

“যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, ‘তোমরা একটু ওইখানে গিয়ে বস। অথবা বলি, যাও বেশ বিল্ডিং (রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল) দেখ গে।’ (সকলের হাস্য)

“আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারী বিষয়বুদ্ধি। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বারবার কানে কানে ফিসফিস করে বলছে, ‘কখন যাবে—কখন যাবে।’ তারা হয়তো বললে, ‘দাঁড়াও না হে,

www.udbodhan.org

আর-একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।' (সকলের হাস্য)

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌরনিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেত। হরিনাম-সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারত যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই; 'যুবতী মেয়ে' কিনা—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা—ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

"নিতাই কোনরকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, **ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য।** শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হলো ও তার ফলও হলো।"

[মনুষ্যপ্রকৃতি ও গুণত্রয়—ভক্তির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ]

"যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে; তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে।"

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কিরকম জানো? বাড়িটি এখানে ভাঙা, ওখানে ভাঙা—মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগছে, উঠানে শেওলা পড়েছে হুঁশ নাই। আসবাবগুলো পুরানো, ফিটফাট করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই একখানা হলেই হলো। লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক; কারু কোনও অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটা আঙটি। বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটি চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানারকমের ভাল পোশাক। চাকরদেরও পোশাক। এমনি এমনি সব।

"সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহংকার এই সব।

"আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। **যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে।** সে হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে—সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে দেরি হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হলো। খাবার ঘটা নাই। পোশাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।

"ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। (সকলের হাস্য) যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পরে পূজা করে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ [গীতা—২।৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। "মারো কাটো বাঁধো!" এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

www.udbodhan.org

ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি, তাঁহার প্রেমরসাভিষিক্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন ঃ

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ॥
কালীনামের এত গুণ, কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিতেছেন ঃ

[নামমাহাত্ম্য ও পাপ—তিন প্রকার আচার্য]

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

"কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে। তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী! এমন রোখ হওয়া চাই!

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর; তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক। আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিনপ্রকার—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কিনা এ-খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে! লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। এই বৈদ্যের তমোগুণ, এ-গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

"বৈদ্যের মতো আচার্যও তিনপ্রকার। ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না—সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বরাবর বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোন আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।"
[তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—২।৪]

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

www.udbodhan.org